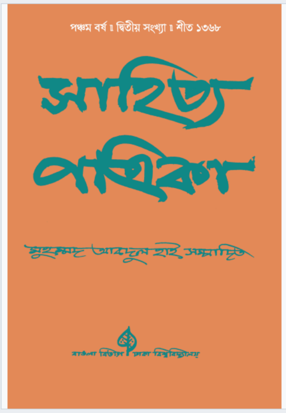

Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা লিপি ও নানান সমস্যা

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.1
Pages	1-30
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
পঞ্চম বর্ষ
শীত, ১৩৬৮

Check for updates

বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা

মুহম্মদ আবদুল হাই

পৃথিবীতে এখনও কিছু ভাষা আছে, আজ পর্যন্ত যার লেখার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। লিখিত হোক বা না হোক, বাগর্থবোধক ধ্বনিই প্রতি ভাষার মূল উপাদান। ভাষা মানুষের মুখে ধ্বনিরূপে ফুটে ওঠে এবং উচ্চারিত হওয়া মাত্রই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। সে জন্যে ধ্বনিকে কোনো রূপের মাধ্যমে ধরে রাখবার, তাকে প্রতীকে চিহ্নিত করবার জন্যে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। অন্য কথায় ধ্বনিবিশেষকে রঙে রেখায় চিহ্নিত করার জন্যে বর্ণের সৃষ্টি। এজন্যে ধ্বনির প্রতীকের একটি নাম বর্ণ। এই বর্ণকে আমরা Letter, হরফ এবং অক্ষরও বলে থাকি। ধ্বনিচিহ্ন বা হরফের বিবর্তন কাহিনী এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলায় কোন্ ধ্বনির কি প্রতীক ব্যবহৃত হয়, কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে বাংলা ধ্বনি ও বানানের সঙ্গতি রক্ষা করে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা যেতে পারে, বর্তমান প্রবন্ধে সে-আলোচনাই করা যাবে।

আমাদের আলোচনা অনুযায়ী বাংলার মূল স্বরধ্বনি (Phoneme) হচ্ছে এগুলো :—ই, এ, এ্যা, আ, 'অ', ও, ও', উ।—৮টি

মূল অর্ধস্বর ধ্বনি :—ই্, 'এ্-(য়্), ও্, উ্।—৪টি

মূল দ্বৈতস্বর ধ্বনি :—ইই্, ইউ্, এই্, এও্, এউ্, এ্যাও্, এ্যায়্, আই্, আও্, আউ্, আয়্, আও্, অয়্, ওও্, ওউ্, ওই্, ওয়্, উই্, উউ্।—১৯টি

মূলস্বর ধ্বনির প্রত্যেকটিই অনুনাসিক হ'তে পারে। তাদের অনুনাসিকতার চিহ্ন—ঁ।

অসংযুক্ত মূল ব্যঞ্জনধ্বনি :— ক, চ, ট, ত, প
খ, ছ, ঠ, থ, ফ
গ, জ, ড, দ, ব
ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ
ঙ, ন, ম
র, ল, শ, হ, ড়, ঢ়—২৯টি।

যথার্থ মূলধ্বনি (Phoneme) না হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ তৎসম শব্দে যে সব ধ্বনির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান তা হচ্ছে হ্ন, হ্র, হ্ল, হ্ম, ঃ। এদের মধ্যে শোয়া (শোওয়া), রোয়া (রোওয়া) প্রভৃতি খাঁটি তদ্ভব শব্দেও শ্রুতিধ্বনি হিসেবে অন্তঃস্থ ব ; যেয়ে, মেয়ে, গিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শব্দে শ্রুতিধ্বনি হিসেবে 'য়' এবং আঃ, উঃ, প্রভৃতি শব্দে আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ হ তথা 'ঃ' ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত এবং সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্ততা বাদ দিলে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা আমাদের পূর্ব আলোচনা মতে ৩৬টি :— স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, শ্ল, স্প, স্ফ, স্পৃ (স্প্র), স্ত্র, ক্র (কৃ), খ্র (খৃ), গ্র (গৃ), ঘ্র (ঘৃ), ছ্র (ছৃ), জ্র (জৃ), ট্র (টৃ), ত্র (তৃ), থ্র, দ্র (দৃ), ধ্র (ধৃ), নৃ, প্র (পৃ), ফ্র, ব্র (বৃ), ভ্র (ভৃ), ম্র (মৃ), শ্র (শৃ), স্র (সৃ), ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল এবং ম্ল।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো :—

-ক্ক, - চ্চ, - ট্ট, - ত্ত, - প্প, গ্‌গ, - জ্জ, - ড্ড, - দ্দ, ব্ব, - ক্‌খ, চ্ছ, - থ্থ, জ্‌ঝ, - দ্‌ধ, - ব্‌ভ, - ড্‌ঢ, - শ্‌শ, - ল্ল, - ল্‌লহ, - র্‌র, - র্‌রহ, - ন্‌ন, ন্‌নহ, - ম্ম, - ম্‌মহ = ২৬টি।

সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো :—

—ঙ্ক, - ঙ্খ, - ঙ্গ, - ঙ্ঘ, - ঞ্চ, - ঞ্ছ, - ঞ্জ, - ঞ্ঝ, - ণ্ট, - ণ্ঠ - ণ্ড, - ন্ত, - ন্থ, - ন্দ, - ন্ধ, - ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ = ১৯টি।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে :—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, = ১১টি।

স্বরচিহ্ন বা কারাদি ঃ—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ = ১০টি

ব্যঞ্জন বর্ণ ঃ— ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত, থ, দ, ধ, ন
প, ফ, ব, ভ, ম
য, র, ল, ব, শ
ষ, স, হ, য়, ড়
ঢ়, ৎ, ং, ঃ, ঁ = ৪০টি।

দুই বর্ণঘটিত যুক্তাক্ষর ঃ—

—ক্ক, - ঙ্ক, - ল্ক, - স্ক
—ক্ষ
—ঙ্খ, - স্খ
—ঙ্গ, - ড়্গ, - দ্গ, - ল্গ
—ঙ্ঘ, - দ্ঘ
—চ্চ, - ঞ্চ, - শ্চ
—চ্ছ, - ঞ্ছ, - শ্ছ
—জ্ঞ, - জ্জ, - জ্জ, - জ্ঝ
—ঞ্ঝ, - ঞ্জ, - ঞ্জ
—ষ্ট, - স্ট, - ক্ট, - ট্ট, - ণ্ট, - প্ট, - ল্ট
—ণ্ঠ, - ষ্ঠ
—ণ্ড, - ড্ড, - ল্ড
—ণ্ণ, - ষ্ণ, - হ্ণ, - ক্ষ্ণ, - গ্ণ
—ক্ত, ত্ত, - স্ত, - ন্ত, - প্ত
—ত্থ, স্থ - ন্থ .
—দ্দ, - ন্দ, - ব্দ
—দ্ধ, ন্ধ, - ব্ধ, - গ্ধ
—গ্ন, ত্ন, - হ্ন, - ঘ্ন, - প্ন, - ম্ন, - শ্ন, - স্ন, - ন্ন, - ধ্ন

—ষ্প, - স্প, - ল্প, - স্প, - ম্প

—স্ফ, - ষ্ফ, - ল্ফ

—ক্ব, - গ্ব, - জ্ব, - ট্ব, - ণ্ব, - ত্ব, - থ্ব, - দ্ব, - ধ্ব, - ন্ব, - ম্ব, - ল্ব, - শ্ব, - স্ব

—ন্ত, - ন্ড,

—ক্ম, - গ্ম, - ঙ্ম, - দ্ম, - ন্ম, - ণ্ম, - ম্ম, - হ্ম, - জ্ম, - ল্ম, - শ্ম, - ষ্ম, - স্ম, - ধ্ম, - ট্ম, - ড্ম,

—ক্য, - খ্য, - গ্য, - ঘ্য, - চ্য, - জ্য, - ট্য, - ঠ্য, - ড্য, - ঢ্য, - ত্য, - থ্য, - দ্য, - ধ্য, - ন্য, - প্য, - ফ্য, - ব্য, - ভ্য, - ম্য, - য্য, - ল্য, - শ্য, - ষ্য, - স্য, - হ্য

—ক্র, - খ্র, - গ্র, - ঘ্র, - ট্র, - ড্র, - ত্র, - থ্র, - দ্র, - ধ্র, - প্র, - ফ্র, - ব্র, ভ্র, - ম্র, - শ্র, - স্র, হ্র

—কৃ, - তৃ, - দৃ, - ধৃ, - নৃ, - পৃ, - বৃ, - ভৃ, - মৃ, - শৃ, - সৃ।

—ক্ল, - গ্ল, - প্ল, - ফ্ল, - ব্ল, - ম্ল, - ল্ল, - শ্ল, - স্ল, - হ্ল।

—র্ক, - র্খ, - র্গ, - র্ঘ, - র্চ, - র্ছ, - র্জ, - র্ঝ, - র্ট, - র্ড, - র্ণ, - র্ত, - র্ৎ, - র্থ, - র্দ, র্দ, - র্ধ, - র্ন, - র্প, - র্ফ, - র্ব, - র্ভ, - র্ম, - র্য, - র্ল, - র্শ, - র্ষ, - র্স, - র্হ।

—ক্স, - প্স, - ন্স

তিন হরফ ঘটিত সংযুক্তাক্ষর :—

ক্ল্য, ক্ষ্য, ক্ষ্ম, ক্ষ্ণ, ক্ত্র, ক্ত্র, ক্ষ্ম, গ্ন্য, গ্র্য, র্ঘ্য, জ্জ্ব, ঙ্ক্র, চ্ছ্র, ঙ্গ্য, র্চ্য, র্ধ্ব, ত্ত্র, ত্ত্ব, দ্ব্য, ন্ত্ব, ন্দ্ব, ন্ধ্য, ন্ত্র, ন্দ্র, ন্ধ্র, ত্র্য, ন্ত্য, ন্দ্য, র্ত্ব, র্ত্য, র্থ্য, দ্ব্য, র্দ্র, ম্ন্য, র্দ্য, র্দ্ব, গ্ন্য, র্চ্ছ, চ্ছ্র, চ্ছ্ব, র্জ্জ, ধ্রু, ম্ব্য, ম্প্র, র্ব্য, ম্ব্র, র্ব্য, শ্রু, র্শ্ব, ষ্ক্র, ষ্কৃ, ষ্প্র, ষ্ণ্য, ষ্ম্য, ষ্ঠ্য, ষ্ট্র, ষ্ট্য, র্ষ্ব, স্ত্র, স্মৃ, স্ত্য, স্তৃ, স্প্য, স্প্র, ণ্ঠ্য, র্ণ্য ঙ্গ্র, র্য্য।

চার হরফ ঘটিত সংযুক্তাক্ষর :—র্দ্ধ্ব, ক্ষ্ম্য (সৌক্ষ্ম্য), ন্ত্র্য (স্বাতন্ত্র্য)।

কারাদি চিহ্নযুক্ত হলে হাতের লেখা এবং ছাপার হরফে নিম্নের গোটা তেতাল্লিশ বর্ণ রূপ পরিবর্তন করে এ ধরনের রূপ ধারণ করে :—

গু, শু, স্তু, রু, রূ, ক্রু, ক্রু, ব্রু, হু, হৃ, হৃ, স্রু, ঙ্কু, ঙ্কু, ট্রু, ণ্ঠু, গু, ষ্ণু, র্তু, ক্রু, থ্রু, ত্রু, ত্রু, দ্রু, ন্ত্রু, ক্রু, ভ্রু, স্থু, স্থূ, ঙ্ক, হ্ক, ঙ্ক, জ্ঞ, জ্ঞ, ক্ষ, ক্ষ, ত্ম, ণ্ঠ, শ্য, ষ্য, স্য।

ধ্বনির প্রতিলিপি অনুযায়ী স্বরবর্ণের সংস্কার করতে হলে প্রথমেই ঈ এবং ঊ বাদ দিতে হয়, কারণ মূলধ্বনি হিসেবে বাংলায় 'ঈ' এবং 'ঊ'র কোনো অস্তিত্ব নেই ; আছে শুধু 'ই' এবং 'উ'। এমন কি হ্রস্ব 'ই' এবং হ্রস্ব 'উ' ও নেই। ইংরেজীর fill ও feel এবং full ও fool প্রভৃতি শব্দে স্বরধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘের বৈপরীত্যে যেমন স্বতন্ত্র অর্থবোধক নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়, বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলোর হ্রস্বতা এবং দৈর্ঘ্য দিয়ে তেমন স্বতন্ত্র শব্দ পাওয়া যায় না। বাংলার প্রতিটি স্বরধ্বনিই দুই বা ততুর্ধ সংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের তুলনায় একাক্ষরিক শব্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যে নিছক উচ্চারণগত (phonetic), মূলধ্বনিগত (phonemic) নয় এ থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বীকার করলে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যেই একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ প্রতীক ব্যবহার করতে হয়। তা যখন সম্ভব নয়, তখন শুধু ঈ এবং ঊ-ই বা রাখা কেন? সুতরাং এ দু'টি বাদ দিয়েই বাংলা স্বরবর্ণমালা নির্ধারণ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার চিহ্ন ী এবং ূ ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

ঈ-ঊ-র সংস্কার

কোনো ভাষাতেই তার যাবতীয় দ্বিস্বর (diphthong) ধ্বনির কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না, তার কারণ দ্বিস্বর ধ্বনি একটি মূলস্বর ও আর একটি অসম্পূর্ণস্বর, এ দুই স্বর ধ্বনির সংযোগে গঠিত। যে দুটি স্বরধ্বনি দ্বিস্বরধ্বনি গঠনে সহায়তা করে তাদের আপনাপন প্রতীকই উক্ত সংশ্লিষ্ট দ্বিস্বর ধ্বনির রূপায়ণের জন্যে যথেষ্ট। তার অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার করলে ধ্বনিটি যথাযথভাবে রূপায়িত হতে পারে বটে, কিন্তু তার প্রয়োজন করে না। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ নামক আমরা দ্বিস্বর ধ্বনির দুটি চিহ্ন পাই অথচ বাংলার নিয়মিত দ্বিস্বর ধ্বনির সংখ্যা ঊনিশটি। যদি বাকী সতেরটির জন্যে স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার না করেও বাংলা ধ্বনির সংশ্লিষ্ট দ্বৈতস্বরগুলোর ধ্বনিবাচকতা রক্ষা পায় তাহলে ঐ (ৈ) এবং এবং ঔ (ৌ) মাত্র এ দুটির জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন কি? এ চিহ্ন দুটি ব্যবহার না করলে এ চিহ্ন-অভ্যস্ত চোখে আপাতত লাগতে পারে, কিন্তু বাংলা বানানে দই (দোই), কই (কোই), বই (বোই) ইত্যাদি শব্দে ঐ (ৈ) এর বদলে অই (ওই) এবং বউ (বোউ), মউ (মোউ) প্রভৃতি শব্দে ঔ (ৌ)-এর

ঐ এবং ঔ-র সংস্কার

বদলে অউ (ওউ)-এর ব্যবহার আমাদের চোখে সয়ে গেছে বৈকি! বাংলা লিপি মিতলিখনের (economy of space) আদর্শ উদাহরণ এবং সেদিক থেকে ৈ এবং ৌ চিহ্নও উক্ত মিতলিখনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সংস্কার করতে হলে স্বল্পতম গ্রহণ বর্জন স্বীকার না করে উপায় কি? তাহলে দ্বৈত স্বরধ্বনির ঐ, ঔ এবং তাদের কার চিহ্ন ৈ ৌ বাদ দিলে স্বরধ্বনির ধ্বনিমূলক প্রতিলিপি এবং তাদের যে কার-চিহ্ন রাখতে হবে সেগুলো:—ই (ি), এ (ে), এ্যা (্যা), আ (া), অ, ও (ো), ও' (’), উ (ু)। এর মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে এ-র অস্তিত্ব থাকার দরুণ 'এ্যা' ধ্বনিটির জন্যে অতিরিক্ত ধ্বনি চিহ্নের প্রয়োজন হয়না। 'এ্যা' ধ্বনিটি রূপায়িত করবার জন্যে শুধু তার কার চিহ্ন '্যা'-ই যথেষ্ট হতে পারে। খ্যালা, ক্যানো প্রভৃতিশব্দে খ ও ক-র পরে ্যা দিয়ে যেমন 'এ্যা' ধ্বনিটি পাওয়া যেতে পারে, তেমনি এ-র পরে ্যা যোগ করলেই উক্ত স্বরধ্বনির প্রতিলিপি নির্ণিত হবে। বাংলা বানানে ্যা- বোধক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে ক্যা, খ্যা, লেখা হবে, না গতানুগতিক ধারায় কে, খে-ই রাখা হবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ধ্বনি প্রবাহে ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাংলায় ি এবং ে-কার চিহ্ন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির আগে এবং ো চিহ্নটি দ্বিখণ্ডিত করে আগে ও পরে লেখা হয়। এ জন্যে এ কালে ধ্বনি অনুযায়ী ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে লেখার কথা হ'লে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরে সংস্থাপন করার কথা অনেকেই বলেছেন। এ সম্পর্কেও পরে আমাদের বক্তব্য পেশ করা যাবে। চলিত বাংলায় 'কোনে' ও 'ক'নে' প্রভৃতি শব্দে 'ও'-র সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে অভিশ্রুত ও'র অস্তিত্ব আছে। বাংলা স্বরবর্ণমালার সংস্কার করতে হলে এ-র অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবে এ্যা হরফটির যেমন প্রয়োজন করে না, তেমনি ও-র অতিরিক্ত 'ও' না রেখে শুধু চিহ্ন হিসেবে ঊর্ধ্ব কমাটি ব্যবহার করলেই চলতে পারে। তাহলে নিম্নতম ধ্বনিভিত্তিক স্বরবর্ণ এবং তাদের কার চিহ্নাদি এভাবে দাঁড় করানো যায়:—

স্বরবর্ণ:—ই এ আ অ ও উ
কারচিহ্ন:—ি ে ্যা া ো’ ু

স্বরবর্ণগুলোর পরে এদের এভাবে সাজানো যেতে পারে:—ই-ি, এ- ে, ্যা, আ-া, ও- ো’ উ-ু।

বাংলার মূল অর্ধস্বরধ্বনি ই্‌, এ্‌ (য়), ও্‌ এবং উ্‌। এই্‌, যায়্‌, যাও্‌, কুউ্‌ প্রভৃতি শব্দে এদের উচ্চারণ হলন্ত হওয়া সত্ত্বেও হস্‌ চিহ্ন দিয়ে এগুলো লিখিত হয়না এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে লেখার প্রয়োজনও করেনা। সুতরাং স্বরচিহ্ন ই, ও, এবং উ-ই এ অবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। মেয়ে (meye), গিয়ে (giye) প্রভৃতি শব্দে ধ্বনি হিসেবে

য় এবং

'য়' শ্রুতির অস্তিত্ব দেখি। এ ধ্বনিটি বাংলায় য় বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। 'এ' অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক হিসেবে য় বর্ণটি গ্রহণ করলে তার সাহায্যে মেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি শব্দের 'য়' শ্রুতি এবং হওয়া, খাওয়া, নেওয়া প্রভৃতি শব্দ শেষে অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতিও লেখা যাবে। সুতরাং বাংলা বর্ণমালায় 'য়' অবস্থানের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। এরই সঙ্গে আসে স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার প্রতীক চন্দ্রবিন্দু ঁ-র কথা। চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্রভাবে কোনো ধ্বনি নেই। যে কোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করবার জন্যে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। এটিকে সে জন্যে diacritical mark ধ্বনিহীন-চিহ্ন বা স্বরধ্বনিকে অনুনাসিকতার ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে কারাদি চিহ্নেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

Phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোনো একটি মূল ধ্বনি বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। একটি মূলধ্বনির উচ্চারণগত এ সামান্য তারতম্য বিশেষভাবে পরিবেশ দ্বারা শাসিত। অর্থাৎ এক পরিবেশে তার যে স্বাতন্ত্র্যটুকু লক্ষিত হয় তা অন্য পরিবেশে নয়, আবার অন্য এক পরিবেশে যে স্বাতন্ত্র্য দেখি তা পূর্ববর্ণিত পরিবেশে পাইনা। বিশেষে বিশেষ পরিবেশে এক মূলধ্বনির উচ্চারণগত বিবিধ পার্থক্য diacritical mark তথা অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন দিয়ে হয়ত বা চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক ধ্বনিগত বর্ণমালায় সূক্ষ্ম লিখন পদ্ধতি (narrow transcription) অনুসারে এক দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি n এর অগ্রদন্তমূলীয় রূপের জন্যে পেটকাটা n, খাঁটি দন্তরূপের জন্য n এর নীচে ‾ চিহ্ন দিয়ে (n̠) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে মূল ধ্বনিচিহ্ন না বাড়লেও অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্নের ব্যবহার বর্ণমালাকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করে বৈকি। সে জন্যে সাধারণ লেখন পদ্ধতি পরিবেশ অনুযায়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনি মূলক না হয়ে নতুন শব্দসৃষ্টির দিক থেকে 'ক' থেকে 'চ' পৃথকধ্বনি কিংবা 'ম' থেকে 'ন' পৃথকধ্বনি—এ ধরনের পার্থক্যের ভিত্তিতে Broad transcription

বদলে অউ (ওউ)-এর ব্যবহার আমাদের চোখে সয়ে গেছে বৈকি! বাংলা লিপি মিতলিখনের (economy of space) আদর্শ উদাহরণ এবং সেদিক থেকে ৈ এবং ৌ চিহ্নও উক্ত মিতলিখনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সংস্কার করতে হলে স্বল্পতম গ্রহণ বর্জন স্বীকার না করে উপায় কি? তাহলে দ্বৈত স্বরধ্বনির ঐ, ঔ এবং তাদের কার চিহ্ন ৈ ৌ বাদ দিলে স্বরধ্বনির ধ্বনিমূলক প্রতিলিপি এবং তাদের যে কার-চিহ্ন রাখতে হবে সেগুলো ঃ—ই (ি), এ (ে), এ্যা (্যা), আ (া), অ, ও (ো), ও' ('), উ (ু)। এর মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে এ-র অস্তিত্ব থাকার দরুণ 'এ্যা' ধ্বনিটির জন্যে অতিরিক্ত ধ্বনি চিহ্নের প্রয়োজন হয়না। 'এ্যা' ধ্বনিটি রূপায়িত করবার জন্যে শুধু তার কার চিহ্ন '্যা'-ই যথেষ্ট হতে পারে। খ্যালা, ক্যানো প্রভৃতিশব্দে খ ও ক-র পরে ্যা দিয়ে যেমন 'এ্যা' ধ্বনিটি পাওয়া যেতে পারে, তেমনি এ-র পরে ্যা যোগ করলেই উক্ত স্বরধ্বনির প্রতিলিপি নির্ণিত হবে। বাংলা বানানে ্যা- বোধক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে ক্যা, খ্যা, লেখা হবে, না গতানুগতিক ধারায় কে, খে-ই রাখা হবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ধ্বনি প্রবাহে ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাংলায় ি এবং ে-কার চিহ্ন ছুটো ব্যঞ্জনধ্বনির আগে এবং ো চিহ্নটি দ্বিখণ্ডিত করে আগে ও পরে লেখা হয়। এ জন্যে এ কালে ধ্বনি অনুযায়ী ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে লেখার কথা হ'লে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরে সংস্থাপন করার কথা অনেকেই বলেছেন। এ সম্পর্কেও পরে আমাদের বক্তব্য পেশ করা যাবে। চলিত বাংলায় 'কোনে' ও 'ক'নে' প্রভৃতি শব্দে 'ও'-র সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে অভিশ্রুত ও'র অস্তিত্ব আছে। বাংলা স্বরবর্ণমালার সংস্কার করতে হলে এ-র অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবে এ্যা হরফটির যেমন প্রয়োজন করে না, তেমনি ও-র অতিরিক্ত ও' না রেখে শুধু চিহ্ন হিসেবে উর্ধ্ব কমাটি ব্যবহার করলেই চলতে পারে। তাহলে নিম্নতম ধ্বনিভিত্তিক স্বরবর্ণ এবং তাদের কার চিহ্নাদি এভাবে দাঁড় করানো যায় ঃ—

স্বরবর্ণ ঃ—ই এ আ অ ও উ

কারচিহ্ন ঃ—ি ে ্যা া ো ' ু

স্বরবর্ণগুলোর পরে এদের এভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ—ই-ি, এ- ে, ্যা, আ- া, ও- ো ' উ- ু।

বাংলার মূল অর্ধস্বরধ্বনি ই্‌, এ্‌ (য়), ও্‌ এবং উ্‌। এই্‌, যায়্‌, যাও্‌, কুউ্‌ প্রভৃতি শব্দে এদের উচ্চারণ হলন্ত হওয়া সত্ত্বেও হস্‌ চিহ্ন দিয়ে এগুলো লিখিত হয়না এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে লেখার প্রয়োজনও করেনা। সুতরাং স্বরচিহ্ন ই, ও, এবং উ-ই এ অবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। মেয়ে (meye), গিয়ে (giye) প্রভৃতি শব্দে ধ্বনি হিসেবে

য় এবং

'য়' শ্রুতির অস্তিত্ব দেখি। এ ধ্বনিটি বাংলায় য় বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। 'এ' অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক হিসেবে য় বর্ণটি গ্রহণ করলে তার সাহায্যে মেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি শব্দের 'য়' শ্রুতি এবং হওয়া, খাওয়া, নেওয়া প্রভৃতি শব্দ শেষে অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতিও লেখা যাবে। সুতরাং বাংলা বর্ণমালায় 'য়' অবস্থানের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। এরই সঙ্গে আসে স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার প্রতীক চন্দ্রবিন্দু ँ-র কথা। চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্রভাবে কোনো ধ্বনি নেই। যে কোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করবার জন্যে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। এটিকে সে জন্যে diacritical mark ধ্বনিহীন-চিহ্ন বা স্বরধ্বনিকে অনুনাসিকতার ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে কারাদি চিহ্নেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

Phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোনো একটি মূল ধ্বনি বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। একটি মূলধ্বনির উচ্চারণগত এ সামান্য তারতম্য বিশেষভাবে পরিবেশ দ্বারা শাসিত। অর্থাৎ এক পরিবেশে তার যে স্বাতন্ত্র্যটুকু লক্ষিত হয় তা অন্য পরিবেশে নয়, আবার অন্য এক পরিবেশে যে স্বাতন্ত্র্য দেখি তা পূর্ববর্ণিত পরিবেশে পাইনা। বিশেষে বিশেষ পরিবেশে এক মূলধ্বনির উচ্চারণগত বিবিধ পার্থক্য diacritical mark তথা অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন দিয়ে হয়ত বা চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক ধ্বনিগত বর্ণমালায় সূক্ষ্ম লিখন পদ্ধতি (narrow transcription) অনুসারে এক দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি n এর অগ্রদন্তমূলীয় রূপের জন্যে পেটকাটা n, খাঁটি দন্তরূপের জন্য n এর নীচে ¬ চিহ্ন দিয়ে (n̪) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে মূল ধ্বনিচিহ্ন না বাড়লেও অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্নের ব্যবহার বর্ণমালাকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করে বৈকি। সে জন্যে সাধারণ লেখন পদ্ধতি পরিবেশ অনুযায়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনি মূলক না হয়ে নতুন শব্দসৃষ্টির দিক থেকে 'ক' থেকে 'চ' পৃথকধ্বনি কিংবা 'ম' থেকে 'ন' পৃথকধ্বনি—এ ধরনের পার্থক্যের ভিত্তিতে Broad transcription

নীতি অনুসারে মূল ধ্বনিভিত্তিক হয়ে থাকে। আমাদের বাংলা লিখন পদ্ধতি কি স্বরবর্ণে কি ব্যঞ্জনবর্ণে এ ধরনের মূলধ্বনিভিত্তিক তথা phonemic নীতির ভিত্তিতে তৈরী। তাতে সংস্কৃত বানান ও লিখন পদ্ধতির অনুসরণে মূল বাংলা ধ্বনির অতিরিক্ত গুটিকতক অপ্রয়োজনীয় বর্ণের সমাবেশ যে নেই তা নয়। বাংলা বর্ণমালায় ঋ, ঞ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ং, ৎ এবং ঃ আমাদের এ-কথার সাক্ষ্য দেবে। স্বরবর্ণ হিসেবে বাংলায় ঋ-র কোনো অস্তিত্ব নেই। ঋ- হরফটি 'রি' (র্+ই) ধ্বনির প্রতীক। সুতরাং স্বরবর্ণে ধ্বনিগত দিক থেকে ঋ রাখার প্রশ্ন ওঠেনা। বানানের দিক থেকে ঋ এবং তার কার ৃ রাখা না রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঞ হরফটির সম্পর্কেও একথা খাটে। এ হরফটিকে আমরা 'ইঁয়ো' নামে অভিহিত করি। কিন্তু তা স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনির প্রতীক নয়। মিঞা প্রভৃতি শব্দে ঞ অনুনাসিক স্বরধ্বনি 'আঁ'র দ্যোতক, 'যাচ্ঞা' শব্দে 'না'র দ্যোতক, 'জ্ঞান' শব্দে 'গ্যাঁ'র দ্যোতক এবং 'বিজ্ঞ' শব্দে 'গগোঁ'র দ্যোতক, আর ব্যঞ্জনা লাঞ্ছনা প্রভৃতি শব্দে 'ন্'এর দ্যোতক। এক এক জায়গায় ঞ হরফটির এক এক রকম উচ্চারণ দেখতে পাই বলে ধ্বনি অনুসারে শব্দের প্রতিলিপিকরণ দেখাতে গেলে ঞ কোথাও টেঁকেনা। কিন্তু প্রচলিত বানান সংস্কারের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে ঞ রাখা না রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য।

বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ নামক দুটি ন রয়েছে। কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এক দন্তমূলীয় ন ছাড়া মূলধ্বনি হিসেবে অন্য কোনো নয়ের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে ণ নেই তা অবিসংবাদিতভাবে সত্য এবং সেজন্যে সহজে এবং নিশ্চিন্তে যদি কোনো হরফ বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া যায় তা হলে তা হবে এ মূর্ধন্য টি। কণ্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড প্রভৃতি

ন, ণ

তৎসম শব্দে ট বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় ন এর সহধ্বনি হিসেবে ণ এর অস্তিত্ব অবশ্য দেখা যায়। সে রকম কাঞ্চন, বাঞ্ছা, মাঞ্জা, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দে চ বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ন এর এবং স্নান, স্নেহ প্রভৃতি শব্দে অগ্রদন্তমূলীয় ন-র এবং সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দন্ত্য ন-এরও অস্তিত্ব বিদ্যমান। স্নান প্রভৃতি শব্দে দন্তমূলীয় ন-এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি এবং সন্তাপ, পন্থা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দন্ত্যসহধ্বনির কোনো চিহ্ন আমাদের বর্ণমালায় না থাকায়

আমরা যখন তাদের আপনাপন পরিবেশে যথার্থ উচ্চারণ করতে অপারগ হইনা, তখন চ বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ন-এর স্বরূপ বাচকতার জন্যে ঞ এবং ট বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনির জন্য ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এ পরিবেশে উক্ত সহধ্বনি নির্ণায়ক প্রতিলিপি ব্যবহৃত হোক বা না হোক বাঙালী তাদের যথার্থ উচ্চারণই করবে। সুতরাং অবাধে বাংলা বর্ণমালা থেকে ণ-কে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

আগেই বলেছি বাংলা বর্ণমালা মূলধ্বনিবাচক, তাদের সহধ্বনিবাচক নয়। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাই ল-বর্ণটিতে। উচ্চারণগত দিক থেকে আল্‌তা, বাল্‌তি প্রভৃতি শব্দে 'ত' এর পূর্বে ল সরাসরি দন্ত্য এবং উল্টা, পাল্টা প্রভৃতি শব্দে ল-র উচ্চারণ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য প্রকৃতির কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় মূলধ্বনি 'ল'-র এ সহধ্বনিগুলো চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এক দন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'ল' দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশে বাঙালী তার বিভিন্ন সহধ্বনির যথাযথ উচ্চারণই করতে পারে। ভর্তা, স্বার্থ, মর্দা, মূর্ধা প্রভৃতি শব্দে 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' এই ত বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে 'র'-র উচ্চারণও তার দন্ত্যসহধ্বনি বাচক। বাংলা লিপিতে তারও কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন নেই। তবু বাঙালী তার যথাযথ উচ্চারণই করে। এ থেকে দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন'র প্রতিলিপি এক ন দিয়ে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য এবং প্রশস্ত দন্তমূলীয় রূপেরও উচ্চারণ যে বাঙালী যথাযথ ভাবে করতে পারে তা স্বতঃ প্রতিপন্ন হয়। বাংলা ধ্বনিগত দিক থেকে ণ এবং ঞ হরফ দু'টি এ কারণেই যে অপ্রয়োজনীয় তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চলিত বাংলার বিশটি স্পৃষ্টধ্বনির মধ্যে প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণতার জন্য যথাক্রমে তাদের স্ব বর্গীয় প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। বাংলা বর্ণমালাকে, স্বল্পসংখ্যক করার জন্যে কেউ কেউ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ না লিখে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের পার্শ্বে মহাপ্রাণতার চিহ্নস্বরূপ একটা হ বসিয়ে খ=ক্‌হ, ঘ=গ্‌হ ইত্যাদি রূপে দেখিয়ে তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চান। রোমান লিপিতে অবশ্য kh, gh রূপে 'খ' 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনি চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে। ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার যেগুলো রোমান লিপি দিয়ে লেখা হয় তাতে এ ধরনের মহাপ্রাণ ধ্বনি নেই দেখে এদেশীয়

খ, ঘ প্রভৃতি মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি

এ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রতিলিপির পার্শ্বে একটি মহাপ্রাণবোধক 'h' চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা করা হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের বাংলা প্রভৃতি সংস্কৃতভিত্তিক ভাষায় এ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো অখণ্ড ও অবিভাজ্য ধ্বনি বলে স্বতন্ত্রভাবে তাদের প্রতিবর্ণীকরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিক থেকে বাংলার বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির বর্তমান প্রতিলিপি খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ-র সংক্ষেপকরণ কিংবা তাদের স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির পার্শ্বে একটা অতিরিক্ত হ বসিয়ে দিয়ে ভিন্নভাবে প্রতিবর্ণীকরণ ধ্বনিগত দিক থেকে অচল এবং দৃষ্টিগত দিক থেকে অসহ্য। সেজন্যে এদের কোনো সংস্কার চলবে না।

চলিত বাংলার ধ্বনিতে হাওয়া ($ha^{w}a$). (পোয়া) (po a), দেওয়া ($de^{w}a$), যাওয়া (ja a), মেওয়া (me a) প্রভৃতি শব্দে 'ব' শ্রুতিহিসেবে অন্তঃস্থ-ব-র অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করবার জন্যে বাংলায় কোনো হরফের ব্যবহার নেই। বাংলা বর্ণমালায় যে অন্তঃস্থ ব আছে বর্গীয় ব থেকে তার আকৃতি অভিন্ন বলে ধ্বনিগত দিক থেকে এই দুই ব-র একটি অতিরিক্ত এবং সেজন্যেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বর্ণমালার সংস্কার করতে হলে সেজন্যে অন্তঃস্থ ব টিকে সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য বানান ধ্বনিমূলক করতে হলে ব-শ্রুতিবাচক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে আসামীর পেটকাটা 'ব' কিংবা হিন্দীর মতো একটি গোল ব-র আমদানি করা যেতে পরে। তাতে একটি বর্ণ বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং নতুন ধ্বনিচিহ্ন বাড়িয়ে লাভ নেই।

অন্তঃস্থ ব

অন্তঃস্থ য সম্পর্কেও এ রকম প্রশ্ন ওঠে। ইংরেজী z কিংবা আরবী ز কি ذ জাতীয় ধ্বনিরই যথার্থ প্রতিলিপি বাংলা অন্তঃস্থ য; অথচ চলিত বাংলায় এ ধ্বনিটি নেই। আমরা যে, যখন প্রভৃতি শব্দ য দিয়ে লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ স্পর্শজাতীয় ধ্বনি 'জ'র। সুতরাং ধ্বনিগত দিক থেকে চলিত বাংলার কোনো শব্দেই য-র দরকার করেনা বলে বাংলা শব্দে জ-বোধক ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের জন্যে য বাদ দিয়ে জ ব্যবহার করাই ভালো। তবে ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ধ্বনির এবং বাঙালী মুসলমানের জীবনে আরবী পারসী শব্দে z বোধক ধ্বনিটির রূপায়ণের জন্যে য রাখা না রাখা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য।

অন্তঃস্থ য

চলিত বাংলায় পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিসধ্বনি হিসেবে মূলধ্বনি পাই একমাত্র 'শ'-কে। কিন্তু সংস্কৃত বানানের ভিত্তিতে বাংলা বর্ণমালায় শ, ষ এবং স এ-তিনটি হরফের প্রচলন আছে। বাংলা বানানেও এ তিনটিই ব্যবহৃত হয়। কষ্ট, কাষ্ঠ প্রভৃতি শব্দে ষ 'শ'-রই দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনি এবং হস্ত, স্থান, স্তন প্রভৃতি শব্দে ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে স-ও 'শ'রই দন্তমূলীয় সহধ্বনি। শ্রাবণ, শ্লীল, স্নেহ, স্পর্শ, প্রশ্ন প্রভৃতি শব্দে বানান যা-ই লিখিনা কেন 'শ'র একটি অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করতে হলে মূল ধ্বনির প্রতিনিধি হিসেবে শ রেখে ষ ও স-কে বাদ দেওয়া যায়। স্থান, স্তন, স্নান, কষ্ট, বেষ্টিত প্রভৃতি শব্দ শ দিয়ে শ্থান, শ্তন, কশ্‌ট ইত্যাদি লিখলেও উচ্চারণ সৌকর্যের দিক দিয়ে তাদের পরিবেশজাত শ-র সহধ্বনিমূলক উচ্চারণ করা হবে এবং কিছু-দিন যেতে না যেতে এ বানানও আমাদের চোখ-সহ হয়ে যেতে পারে। এ প্রস্তাব মতে সে, আসে প্রভৃতি শব্দকে শে, আশে ধরনে লিখতে হবে। তাতে আশা (come) এবং আশা (hope) দুটোই 'আশা' লিখিত হলে বাক্যের পরিবেশই তাদের অর্থ উদ্ধারে সহায়তা করবে।

শ, ষ, স

বাংলায় ধ্বনিগত দিক থেকে ঙ এবং ং অভিন্ন। বাংলায় যে তিনটি মূল অসংযুক্ত অনুনাসিক ব্যঞ্জন ধ্বনি পাই তার মধ্যে পশ্চাত্তালুজাত ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি একটি। তাকে ঙ এবং ং এ দুটোর মধ্যে যে-কোনো একটি চিহ্নে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কারণ বাংলার বহির্বর্তী হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার ং এর মতো বর্গীয় ধ্বনির পূর্বেকার নাসিক্যধ্বনি চিহ্নের মতো বাংলায় অনুস্বারের ব্যবহার হয়না। অবশ্য বাংলায় ং এর ধ্বনি কিংবা (কিম্বা) শব্দটিতে ছাড়া সর্বত্রই ঙ-র প্রতিরূপ। এবং কিংবা শব্দটির ধ্বনিমূলক বানান কিম্বা এখন বেশ প্রচলিত। বাংলা হরফ সংস্কার করার প্রস্তাব করলে কেউ ং এবং কেউ ঙ রাখতে চান। বাংলার পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিটি ক বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনি গুলোর অনুগামী ব'লে তাকে ঙ দিয়ে লেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাতে কঙ্ক, সঙ্খ, সঙ্গ, সঙ্ঘ প্রভৃতি শব্দে ঙ দিয়ে লেখা যেমন অধিকতর চক্ষুসহ

ঙ, ং

হয়, তেমনি রাঙা, রঙীন, সাঙাত, আঙুল প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির অন্তর্বর্তী অসংযুক্ত এ নাসিক্য ধ্বনিটিতে কার চিহ্ন বসানোও সহজ হয়; অনুস্বারে কার চিহ্ন ংা, ংু ব্যবহারের মত দৃষ্টিকটু ঠেকেনা। এ জন্যেই আমি ং এবং ঙ-র মধ্যে ঙ রাখার পক্ষপাতী।

ত, ৎ

খণ্ড ৎ-এ 'ত' এর অতিরিক্ত কোনো ধ্বনি নেই। সে জন্যে বাংলা বর্ণমালায় ৎ রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অত্যন্ত সহজে এটিকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে।

ড় ও ঢ় এর মধ্যে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে অনেকেই ড় রেখে ঢ় বাদ দিতে চান। তাঁদের মতে আষাঢ়, দৃঢ়, গাঢ় প্রভৃতি শব্দে এ-তাড়িত ধ্বনিটির দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপটি মহাপ্রাণতা হারিয়ে আষাড় (আষার), দৃড় (দৃর), গাড় (গার) রূপে উচ্চারিত হয় এবং অনেকেই স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ

ড়, ঢ়

সৃষ্টিকারী 'ড়' ও 'ঢ়'-র ধ্বনিগত বৈপরীত্য রক্ষা করেন না ব'লে ড় কিংবা র-র অতিরিক্ত ঢ় ব্যবহারের যৌক্তিকতা মানতে চান না। কিন্তু চলিত বাংলায় গাড় (উচ্চারণ গাড়ো) এবং গাঢ় (উচ্চারণ গাঢ়ো) প্রভৃতি শব্দে মূলধ্বনি (Phoneme) হিসেবে এ দু'টি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য না মেনে উপায় আছে বলে মনে হয় না। এ জন্যেই বাংলা বর্ণমালায় ড়-র অতিরিক্ত ঢ় রাখা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ঃ এর যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় নেই। ক্রমশঃ, আপাতঃ, প্রধানতঃ, সাধারণতঃ প্রভৃতি শব্দে এ-কালে যে বিসর্গ উচ্চারিত হয় না তা-ই নয়, বানানেও দেখানো হয় না। আঃ! ওঃ! উঃ! ইঃ! প্রভৃতি অব্যয়ে ঃ লেখা হয় বটে কিন্তু তা আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ শিস ধ্বনিই; ঃ নামক অতিরিক্ত চিহ্ন ব্যবহার না করে মহাপ্রাণ অঘোষ হ্ দিয়ে তার প্রতিবর্ণীকরণ করা যেতে পারে। দুঃখ, মনঃপুত প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে বিসর্গের ব্যবহার পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণকে দ্বিগুণ করে দেয়। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে বিসর্গ না রেখে তাদের ধ্বনি অনুগামী বানান দুক্খ, মনোপুত কিংবা মনপ্পুত লেখাই শ্রেয়।

এযাবৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলা দেশের (কি পূর্ব পাকিস্তান, কি পশ্চিম বঙ্গের) ভাষাবটিত কোনো জরিপ হয় নি। গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁর linguistic survey of India গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বাংলার উপভাষার যে বিবরণ দিয়েছেন

তা যথার্থ বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। ভাষার অঞ্চলগত সীমানা (isogloss) নির্ধারণ করে হাল আমলের বর্ণনাত্মক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষাগুলোর জরিপ করলে চলিত বাংলার ধ্বনি সমষ্টির সঙ্গে তাদের ধ্বনিগুলোর আশ্চর্য তারতম্য ও পার্থক্য দেখা যাবে। আর এ পার্থক্য লক্ষিত হবে বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তিক উপভাষাগুলোতে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার গ্রামাঞ্চল, নোয়াখালী সন্দ্বীপের অধিকাংশ স্থানে এবং সিলেট চট্টগ্রামে চলিত বাংলার প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনির শিসজাত উচ্চারণ, সিলেট ঢাকা শহরের কুট্টিদের মুখে এদের যথার্থ ঘৃষ্ট স্পৃষ্ট উচ্চারণ, সিলেট চট্টগ্রামে খ ধ্বনির শিসজাত আরবী خ-র মতো উচ্চারণ, নোয়াখালীতে ফ, ভ-র দন্ত্যৌষ্ঠ শিসজাত উচ্চারণই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ হলেই আমাদের ভাষার এ উপভাষাগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো এবং তখনই এদের ধ্বনিগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কেও একটি স্থির নির্দেশ দেওয়া যেতে পারবে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপির (International phonetic script) সাহায্যে একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্বমূলক একটি বর্ণের ব্যবহার যে কোনো সময়েই করা যায় কিন্তু প্রচলিত বাংলা লিপির সাহায্যে কিভাবে তা করা যাবে সমস্যা সেখানেই।

আঞ্চলিক ধ্বনির প্রতিলিপিকরণ

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ বর্গীয় শিসধ্বনিগুলোকে এখানকার অনেকেই ছ-দিয়ে লিখতে চান। আবার ইসলাম, মুসলিম, ইনসান প্রভৃতি আরবী শব্দের س এর প্রতীক হিসেবেও ছ ব্যবহার করতে চান। কিন্তু চলিত বাংলাতে ছ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে যত কিছু মতবিরোধ এবং গোলোযোগের সূত্রপাত হতে দেখি। এরকম ক্ষেত্রে চলিত বাংলার মূলধ্বনির প্রতীক হিসেবে 'স' বর্জন করে (কেননা সেখানে শ-ই একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ধ্বনি) আরবী প্রভৃত বিদেশী ভাষার س এর প্রতীক হিসেবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ছ-জাতীয় শিসধ্বনি হিসেবে স ব্যবহার করা যায়। অন্যত্র শিসজাত ফ ও খ-র নীচে ফুট্‌কী জাতীয় কোনো চিহ্ন দিয়ে কিংবা ভাষাতত্ত্ব ঘটিত কোনো গ্রন্থের মুখবন্ধে তাদের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে চলিত বাংলার

চ, ছ

সাধারণ খ-ফ প্রভৃতি বর্ণ দিয়েই কাজ চালানো যেতে পারে। সাধারণ বই-পুস্তকে অবশ্য এসব উল্লেখ করে লেখন-রীতি ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই।

চলিত বাংলায় ন, ল, র এবং ম মূলধ্বনি কয়টির একটি করে মহাপ্রাণ রূপ আছে। তারা তাদের স্বল্পপ্রাণ রূপের সঙ্গে শব্দের অর্থগত দিক দিয়ে কোনো বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং তারা মূলধ্বনি নয়; তবু চিহ্ন, অপরাহ্ণ, আহ্লাদ, হৃদ, বর্হ এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক তৎসম শব্দে হ্ন, হ্ল, হৃ, এবং হ্ম এ-মহাপ্রাণ ধ্বনি কয়টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধ্বনি প্রকৃতির দিক থেকে এরা খ, ছ, ঠ, থ, ফ প্রভৃতি বর্গীয় স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতোই কিন্তু এগুলো একটি বর্ণে চিহ্নিত না হয়ে এ ধরনের সংযুক্ত বর্ণ সহযোগে লিখিত হয় বলে সাধারণ্যে এরা সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবেই পরিচিত। হরফ সংস্কার করতে হলে এদের ধ্বনিরূপ অনুযায়ী খ, ছ, ঠ, থ, ফ ইত্যাদি বর্ণের মতো কোনো একটি বর্ণে চিহ্নিত করাই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত প্রস্তাব; কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ নতুন হরফের সৃষ্টি করতে হয়। সেক্ষেত্রে আবার অন্যান্য সমস্যা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠবে। সেজন্যে তাদের বর্তমান রূপের সঙ্গে

হ্ন, হ্ণ, হ্ল, হৃ হ্ম

যোগ রেখে হ্ন-কে ন্‌হ, হ্ল-কে ল্‌হ, হ্ম-কে ম্‌হ দিয়ে লেখার প্রস্তাব করি। কেউ কেউ হ্ন-কে হ্ন এবং হ্ম কে হ্ম রূপে লিখতে চান। হৃ বা হ্ব-র কোনো পরিবর্তন না ক'রে শুধু হৃ-কে এ ভাবে বিকৃত না ক'রে হ্‌ৃ-ভাবে লিখতে হবে। তা হ'লে চিহ্ন, আহ্লাদ, ব্রহ্মা প্রভৃতির লেখ্য রূপ দাঁড়াবে চিন্‌হ. চিনি্‌হত, আল্‌হাদ, ব্রম্‌হা। আর হৃত বা হৃদয় হবে হ্‌ৃত এবং হ্‌ৃদয়।

আমরা দেখেছি বাংলায় সংযুক্ত অক্ষর আছে প্রায় আড়াই শ'র মতো, কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা মতো শব্দের শুরুতে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ৩৬টি এবং শব্দের মাঝখানে ২৮টি। সে যা হোক এ সংযুক্ত অক্ষরগুলো বাংলা লিখন প্রণালীর দোষ ও গুণের আকর হয়ে রয়েছে। একালে সে জন্যে বাংলার সংযুক্ত বর্ণ সম্পর্কে নানা তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সংযুক্ত অক্ষরের বিরুদ্ধ পক্ষের অভিযোগ—একটি শিশুকে বাংলা হরফ আয়ত্ত করতে হলে প্রচলিত বর্ণমালায় ১১টি স্বরবর্ণ, কারাদি ১০টি এবং গু, শু, রূ প্রভৃতি আকৃতি পরিবর্তনকারী গোটা ৩২ হরফের অতিরিক্ত শও আড়ায়েক সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে তার পরিচয় থাকা দরকার। তা বহু সময় সাপেক্ষ এবং যথারীতি অসুবিধাজনক। এ ছাড়া তাঁদের মতে ছাপা ও

টাইপের কাজেও যুক্তাক্ষরগুলো অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ অসুবিধা থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ কেউ সংযুক্ত অক্ষরগুলোকে রোমান লিখন পদ্ধতি অনুসারে যেমন স্থান, পরীক্ষা, রবীন্দ্র প্রভৃতি শব্দে স্থান, পরীক্‌ষা, রবীন্‌দ্‌র রূপে ভেঙে লিখতে চান আর কেউ কেউ বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত 'অ' ধ্বনিটিকেও সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের পরে লিখে কারাদি চিহ্ন ব্যবহার না করে, সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলোকে একেবারে ভেঙে দিয়ে 'শ্রীকান্তকে' 'শ্‌রঈকআনতঅ' 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে 'রঅবঈনদরঅনআথ ঠআকউর' রূপে লিখতে চান। এভাবে লিখলে তাঁদের মতে আর কোন সমস্যাই থাকবেনা এবং যে কারুর পক্ষেই বাংলা লিখন আয়ত্ত-করা সহজসাধ্য হবে।

লিখন পদ্ধতি হয় পদানুসারী, না হয় মূলধ্বনির ধর্মানুসারী হয়। একটি বর্ণ ন্যূনতম অর্থসূচক একটি পদধর্মের (morpheme) প্রতীক হয়ে দাঁড়ালে তাকে পদ-ধর্মানুসারী তথা morphemic লিখন পদ্ধতি বলা যায়। চীনে ভাষার লিখন পদ্ধতি এ ভাবের পদানুসারী। কিন্তু একটি বর্ণ একটি মূল ধ্বনির (phoneme) যাবতীয় অন্তর্ধ্বনিসহ তার সমগ্র ধ্বনিধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হ'লে তাকে ধ্বনিমূলক বা phonemic লিখন পদ্ধতি বলা যায়। phonemic লিখন পদ্ধতিতে একটি ধ্বনির প্রতীক হিসেবে a, k, m, n, প্রভৃতি রোমান বর্ণমালার একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে। এ রকম হ'লে সে-লিখন পদ্ধতিকে নিছক হরফ ভিত্তিক বা alphabetic বলা হ'য়ে থাকে। আবার দেব-নাগরী লিখন পদ্ধতি অনুসারে এক বা একাধিক ধ্বনির জন্য একটি বর্ণের ব্যবহার করলে তাকে অক্ষর ভিত্তিক বা syllabic বলা হয়।

বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী বর্ণমালার আদর্শে গঠিত। এ আদর্শ অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলোর প্রত্যেকটিই একটিমাত্র ধ্বনির প্রতীক। কিন্তু বর্ণমালায় ঙ, ঞ, য়, ং, ঃ এবং ৎ ছাড়া যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণই একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং 'অ' স্বরধ্বনির দ্যোতক; অন্য কথায় এ ক'টি ছাড়া বাংলা বর্ণ মালার এক একটি বর্ণ একদিক দিয়ে যেমন ধ্বনিমূলক তেমনি অ, আ, ই কিংবা ক, খ, জ, ঝ প্রভৃতি যাবতীয় বর্ণই এক একটি অক্ষর বা সিলেবলকে ধারণ ক'রে রয়েছে। এজন্যে বাংলা বর্ণমালাকে ইংরেজীতে alphabet বা syllabary দু-ই বলা যায়।

বাংলা বর্ণমালা alphabetic না syllabic

ধ্বনিবাচকতা এবং মিত-লেখনের দিক থেকে অক্ষর ভিত্তিক বর্ণমালা যে-কোনো ভাষার জন্যেই আদর্শ স্থানীয় হ'তে পারে। বাংলা লিপিও এদিক থেকে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বর্ণমালায় মূলধ্বনি ধর্মানুসারী তথা phonemic আদর্শ-স্থানীয় হয়েও ভাষার প্রতিলিপি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে গিয়ে এর কিছু অসঙ্গতি এ লিপির পক্ষে পূর্ণ অক্ষরভিত্তিক হবার অন্তরায় সৃষ্টি ক'রেছে। আর এ অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে 'অ' ধ্বনিটিকে নিয়ে। শব্দের শুরুতে ছাড়া স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে 'অ' ধ্বনির প্রতীক হিসেবে অ-হরফটির আর কোথাও ব্যবহার হয় না। অতি, অভ্যাস, প্রভৃতি শব্দে অ আবার 'ও' স্বরধ্বনিরও প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ব্যঞ্জন বর্ণে ব্যবহৃত হবার জন্যে তার স্বতন্ত্র কোনো কার-চিহ্নও নেই।

অন্যান্য স্বরবর্ণগুলোও শব্দের শুরুতে তাদের স্বমূর্তিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে তাদের ি, ু, ো কারাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ব'লে তারা কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাদের ধ্বনি সংশ্লিষ্ট কারাদি চিহ্নের সাহায্যে যথাযথ রূপায়িত হয়। কিন্তু বর্ণমালায় প্রায় প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' হলেও শব্দের মধ্যে ক, চ প্রভৃতি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই ন্যূনপক্ষে চারটি ধ্বনির প্রতীক হতে পারে। যেমন ক=ক্, কঅ, কো, কো'; চ=চ্, চঅ, চো, চো'। তুলনীয় বাক্, ভক্ত (ভক্তো); কঅলা মঅরা; করি (কোরি), কল্য (কোল্লো); করে (কোরে), গলে (গোলে) ইত্যাদি। নিয়মানুগতার দিক থেকে এ রকম ব্যবহার জটিলতারই সৃষ্টি করে। এ ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা লিপি মূলধ্বনিমূলক (phonemic) এবং একই সঙ্গে প্রধানত হরফ ভিত্তিক (alphabetic) এবং অক্ষরভিত্তিক (syllabic) দুই-ই। আর তার এ ধ্বনিবাচক হরফ ভিত্তিকতা এবং অক্ষর ভিত্তিকতা দুটি বৈশিষ্ট্যই বাংলা লিপিকে মিতলিখনে (economy of space)র দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় করে তুলেছে। কত, দ্রুত, ক্ষয় প্রভৃতি শব্দের লিখনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কত শব্দটির ক্+অ+ত্+অ; দ্রুত শব্দটির দ্+র+উ+ত্+অ এবং ক্ষয় শব্দটির ক্+ষ্+য় ধ্বনি অত্যন্ত অল্পপরিসরে দুই দুটি মূলবর্ণেই প্রতিফলিত হয়। এবং উক্ত মূলবর্ণ দুটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মূলশব্দটির যাবতীয় ধ্বনিও উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে বাংলা শব্দের লেখন দ্রুতি (speed) এবং পঠনশীলতা (legibility) আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলা লেখন পদ্ধতি (১) ধ্বনির যথার্থ প্রতিরূপ (২) মিতলেখন এবং (৩) দ্রুত পঠনশীলতা এ তিনটি মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলায় ল-ফলা, ্-ফলা ৃ-ফলা, স্ক, স্থ প্রভৃতি এবং দ্বিত্ববোধক যে সব সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রচলন দেখি সেগুলো বাংলা সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতার প্রতিলিপি হিসেবে আশ্চর্য ধ্বনিমূলক। প্লাবন, ত্রাণ, স্ত্রী, মৃত্যু, অস্পৃশ্য প্রভৃতির সঙ্গে প্‌লাবন, ত্‌রান, স্‌ত্‌রী, মীরীত্‌তু বা ম্রীত্‌তু ইত্যাদির তুলনা করলে পরবর্তী লিখনপদ্ধতিতে বাংলা ধ্বনির সংযুক্ততা ও একাত্মতা যে বজায় নেই তা সহজেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয়ত স্বল্পপরিসরে বহুকথা লিখনোপযোগী লিপিহিসেবে বাংলা যুক্তাক্ষরের উপযোগিতা অতুলনীয়; মৃত্যু এবং মীরীত্‌তু, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও রওবইনদ্‌রঅনআথ ইত্যাদির তুলনা থেকেই তা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত একটি ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে একটি বর্ণ (যেমন অ, আ, ই, ক্, চ্‌ ইত্যাদি), আবার শব্দের আদিতে বা শেষে অ-ধ্বনির কোনো প্রতিরূপ ব্যবহার না করে কত, কর, ক্ষমা, হ্রদ প্রভৃতি শব্দে একটি অসংযুক্ত কি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে অ-বোধক এক একটি অক্ষর (সিলেবল্‌) এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলোতে একাধিক ধ্বনি অল্প পরিসরে একত্রে পাওয়ায় বাংলা বাক্‌ প্রবাহের পঠনদ্রুতি বৃদ্ধি পায়। এ জন্যে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির দিক থেকেই সংযুক্তাক্ষর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অন্যথায় সংযুক্তাক্ষরগুলোকে ভেঙে লিখলে বাংলা হরফের পঠনশীলতা ও লেখনদ্রুতি কমে যাবে, মিতলেখন ব্যাহত হবে। বিশেষত শব্দের আদিতে এমনকি মাঝখানেও সংযুক্ত ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যাবেনা। সর্বোপরি অগণিত শব্দের চেহারা পালটে যাবে। এ পাঁচটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও শেষোক্তটিই যুক্তাক্ষর বর্জনের সবচেয়ে বিপক্ষে দাঁড়ায়।

সংযুক্তাক্ষর

সভ্য জগতে প্রত্যেক ভাষার শব্দাবলীরই একটি শ্রুতিগত এবং একটি চক্ষুগ্রাহ্যরূপ আছে। শত শত বছর ধরে একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উক্ত ভাষার শব্দাবলী যেমন ধ্বনিত হয়ে আসে, তেমনি তাদের লেখ্যরূপও যুগে যুগে সে ভাষাভাষীদের চক্ষুসহ হয়ে যায়। তার চক্ষুগ্রাহ্য চেহারার আমূল পরিবর্তন করতে গেলেই সে ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কারে আঘাত লাগে। তাই পরবর্তী পরিবর্তন উন্নত ধরনের কিংবা বিজ্ঞান ভিত্তিক হলেও ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবশত সে সংস্কার তারা গ্রহণ করেনা। এজন্যেই ইংরেজী বানান অদ্ভুত রকমের অ-ধ্বনিতাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের বানানের পরিবর্তন করে না। বর্ণার্ড শ'র উইল থাকা সত্ত্বেও তা আন্তর্জাতিক ধ্বনিভিত্তিক হরফে লেখা হয় না। অন্যান্য দেশে

এমনকি আমাদের দেশেও সহজতর ও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক রোমান হরফ গ্রহণ করা হয় না এবং প্রচলিত হরফ সংস্কার করতে গিয়ে ে, ৈ, ি-কারাদি হরফের বাম থেকে ডানে (যেমন ক১, কি ইত্যাদি) কিংবা তাদের মাথায় (যেমন ক', খ' ইত্যাদি) বসানো হয় না। এমনকি আমাদের বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে তিব্বতী হরফের অনুকরণে অ, আ অি, অী, অু, অূ, অৃ, অ৯, অে, অৈ, অো, অৌ রূপে অ-মাতৃক করে লিখে অন্ততঃ গোটা নয়েক হরফ কমিয়ে দিতে গিয়েও দেওয়া যায় না।

ফেরদৌস খাঁর হিসাব মতো বাংলায় যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দ সংখ্যা হচ্ছে ৯২৪৪।* আমার মনে হয় এ ধরনের যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দের সংখ্যা বাংলায় আরও কিছু বেশী হবে। বাংলায় যুক্তাক্ষর বর্জন করলে প্রায় হাজার দশেক শব্দের লেখ্যরূপ পালটে যাবে বলে আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারকে তা ভীষণভাবে আঘাত করবে। স্বভাবতঃ ঐতিহ্যপ্রিয় বাংলা ভাষাভাষীগোষ্ঠী বাংলা হরফের এ সংস্কার কিছুতেই গ্রহণ করবে না।

তবে বাংলা সংযুক্তাক্ষরগুলোর কিছু যে সহজীকরণ করা যায় না তা নয়। অক্ষরের সংযুক্ততার দিক দিয়ে বাংলায় আড়াইশ'র মতো সংযুক্ত অক্ষর থাকলেও পৃথক পৃথক রূপের দিক থেকে তাদের মোট সংখ্যা সাত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের বেশী নয়। যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনিসৃষ্টির উপকরণ তরল ধ্বনি 'ল'' র' (্র, ৃ) এবং শিস ধ্বনি 'শ' এবং তার সহধ্বনি 'স' ও 'ষ' র অতিরিক্ত ক থেকে ল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত হরফই ফলা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে তাদের সংখ্যা এভাবে ফেঁপে উঠেছে। এর ওপরে অসংযুক্ত কি সংযুক্ত কতকগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ু কার, ূ কার, এবং ৃ কার যুক্ত হয়ে গু, শু, রু, রূ, হৃ প্রভৃতি ধরনে তাদের রূপ বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলা লেখন পদ্ধতিকে জটিলতর ক'রে তুলেছে।

এদিক থেকে কিছু সংস্কারের অবকাশ থাকলেও র-ফলা, রেফ এবং য-ফলার সংক্ষিপ্ত রূপ ্র ৰ্ এবং ্য রাখতে হবে। ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের সংক্ষিপ্ততা এবং মিতলেখনের দিক থেকে এ সংকেত তিনটি অত্যন্ত উপযোগী।

---

*হরফ সমস্যা, বাংলা এ্যাকাডেমী পত্রিকা। পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪

বাংলায় স্বরধ্বনি হিসেবে ঋ-র অস্তিত্ব না থাকলেও এবং ঋ সম্বলিত শব্দ মাত্র ১৩ টি হলেও ৃ কার যুক্ত শব্দ সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশোর মতো। তা ছাড়া তৎসম শব্দে ৃ কার না রাখলে শুধু যে দৃষ্টিকটু ঠেকবে

ঋ, ৃ

তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঋণ, ঋতু, কৃত, মৃত, প্রকৃত-র মতো শব্দের ধ্বনি প্রকৃতিও ব্যাহত হবে। সুতরাং ঋ ও ৃ কার রাখা শেষপর্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

ঞ, জ্ঞ

চঞ্চু, বাঞ্ছা, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে ঞ সম্বলিত যুক্তাক্ষরে ঞ বাদ দিয়ে চন্‌চু, বান্‌ছা, গন্‌জনা, ঝন্‌ঝা রূপে ভেঙে লিখলেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞ হরফটি রাখলে ভালো হয়।

ক্ষ

ক্ষ-হরফটি সম্পর্কেও একথাই খাটে। শব্দের শুরুতে এর উচ্চারণের প্রতীক খ এবং মাঝখানে ক্‌খ না লিখে এর যথার্থ রূপ ক্ষ রাখা মিতলেখনের দিক থেকেই অধিকতর সঙ্গত।

য, হ্য

য-ফলাতো থাকবেই কিন্তু হ্য টিকে ধ্বনিমূলক করে সহ্য, বাহ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি শব্দকে সজ্‌ঝ, বাজ্‌ঝ, অগ্রাজ্‌ঝ ভাবে লেখাই সুবিধাজনক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ ছাড়া গু, শু, রু, ক্রু, ত্র, ভ্র, ত্রু, ত্র, দ্রু, ব্রু, ব্রূ, হৃ, হু, ঙ্গ, ঞ্চ, ঞ্জ, ঞ্ছ, ত্ত র্ত্ত, ত্ব, ক্ত, ত্থ, ন্ত্র, ন্থ, স্থ, স্তু, ঙ্খ, দ্ধ, ন্ধ, ঙ্ক, ট্র, ষ্ণ, ষ্ঠ, শু, ক্ষ, ত্ম, শ্ম, ষ্ম, স্ম এ ধরনের হরফগুলোর একটিও রূপ বদল করতে পারবে না। লাইনো টাইপে প্রচলিত অসংযুক্ত হরফকে অক্ষুণ্ণ রেখে গু, শু, রু, রূ ইত্যাদি রূপে তাদের যেমন পরে উ-কারাদি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তেমনি ঙ্গ, ক্ত, স্ব, গু, ত্থ, স্থ, প্রভৃতি সংযুক্ত হরফের চেহারা বিকৃত না করে

হরফের আকৃতি পরিবর্তন

তাদেরকে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্ঘ, ঙ্খ, ক্‌ত, ম্‌ব, ন্‌ড, ত্‌থ, স্‌থ ইত্যাদিরূপে প্রথমটিতে হস্ চিহ্ন দিয়ে কিংবা মাত্রা না দিয়ে প্রথমটিকে ছোট করে পাশাপাশি লেখা যেতে পারে। ত্র, ভ্র ত্রু, ক্র প্রভৃতি র-ফলা সংশ্লিষ্ট যুক্তাক্ষর ত্‌র, ত্‌রু, ভ্‌র, ক্‌র ইত্যাদিরূপে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। যাচ্‌ঞা-কে জাচ্‌না লিখতে হবে।

জ্বালা, শ্বাস, শ্বাপদ প্রভৃতি শব্দের গোড়ায় বাংলা ব-ফলার যেখানে কোনো উচ্চারণ নেই সেখানে ব-ফলা ফেলে দিয়ে শব্দের মাঝখানে অশ্বয়,

ব-ফলা

বিশ্ব, বিল্ব, নিশ্বাস, আশ্বাস প্রভৃতি শব্দের ব-ফলা যেখানে তার সংশ্লিষ্ট ধ্বনিকে ডবল ক'রে দেয়, কিংবা বিম্ব, লম্বা প্রভৃতি শব্দে যেখানে 'ব'-র উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে সেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ধ্বনি অন্তঃস্থ ব-র জন্য নতুন চিহ্ন আমদানী না ক'রে প্রচলিত বর্গীয় ব-ফলার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখাই শ্রেয়।

ৃ-কার ও র-ফলা, য-ফলা, ব-ফলা ক্ষ এবং জ্ঞ ছাড়াও বাংলা লিখন রীতিতে ক, খ, গ, ঘ, চ, ট, ত, থ, ন, প, ফ, ম, ল, শ (স) ফলা আছে। উচ্চারণ সৌকর্য, মিতলেখন এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তাদের ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

তবে শ্মশান এবং পদ্ম প্রভৃতি ম-ফলা সম্বলিত শব্দে যেখানে ম-এর কোনো উচ্চারণই নেই সেখানে শশান এবং পদ্দ এবং আত্মা, মহাত্মা প্রভৃতি

ম-ফলা

শব্দে যেখানে ম-ফলা পূর্ব্বস্বরকে অনুনাসিকৃত করে সেখানে আঁত্‌তা, মহাঁত্‌তা লেখা এবং গুল্ম বল্মীক, কাশ্মীর প্রভৃতি শব্দে ম-ফলা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।

ওপরের আলোচনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত বাংলা হরফের যা চেহারা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এগুলো :—

স্বরবর্ণ :—অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, ও

কার চিহ্ন :—া, ি, ু, ে, ্যা, ো, এবং ও'র জন্যে ' কমার ব্যবহার।

সাধারণ ব্যবহারের জন্য নয়, বরঞ্চ পাণ্ডিত্যমূলক উদ্দেশ্যে বিদেশী ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের (transliteration) জন্য ঈ(ী), ঊ (ূ) রাখা যেতে পারে।

কার চিহ্নের রূপ ও স্থান বদল না করে তাদের প্রচলিত ব্যবহারই রাখতে হবে।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ :—

ক	খ	গ	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ
ট	ঠ	ড	ঢ
ত	থ	দ	ধ

প ফ ব ভ

য় র ল শ হ

ঙ ন ম ড় ঢ়

ঋ ৎ ঁ

বিদেশী ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের জন্য স এবং য রাখা যেতে পারে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ :—হ্ল, হ্র, ন্হ ম্হ, ক্ষ, জ্ঞ।

্, ^, া, এবং ৃ-কার ছাড়া কোনো বর্ণের রূপ বিকৃত না করে অন্যান্য ফলার ব্যবহার যেমন :—ক্ক, ঙ্ক, ল্ক, শ্ক, ঙ্খ, শ্খ ঙ্গ, ড়্গ, ল্গ, দ্গ, ঙ্ঘ, দ্ধ, ন্চ, শ্চ, চ্চ, ন্ছ শ্ছ, চ্ছ, ন্জ, জ্জ, জ্জ, জ্ঝ, ন্ঝ, চ্ন, শ্ট, ক্ট, ট্ট, ণ্ট, প্ট, ল্ট, ণ্ঠ, শ্ঠ, ন্ড, ড্ড, ক্ত, ত্ত, শ্ত, ন্ত, প্ত, ত্থ, শ্থ ন্থ, ন্দ, দ্দ, ব্দ, দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ গ্ধ, গ্ন, ত্ন ঘ্ন, প্ন, ম্ন, শ্ন, ন্ন, ধ্ন, ল্ন, শ্প, ষ্প, স্প, শ্ফ, স্ফ, ল্ফ, ক্ব, গ্ব, ছ্ব, জ্ব, ট্ব, ন্ব, ত্ব, থ্ব, দ্ব, ধ্ব, ন্ব, স্ব, ল্ব, শ্ব, হ্ব, ব্ব, ন্ত, দ্ভ, ত্ম, দ্ম, ন্ম, স্ম, জ্ম, ল্ম, গ্ম, শ্ম, ক্ম, ট্ম, ক্ল, গ্ল, প্ল, ব্ল, ফ্ল, ম্ল, ল্ল, শ্ল। এ-সব ফলা বিশিষ্ট হরফ বিকৃত না হ'লে নতুন ক'রে শিখতে হবেনা। ধ্বনির সংযুক্ততা এবং একাত্মতার দিক থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ওপর-নীচে কিংবা পাশাপাশি লিখলেই চলে যাবে।

বানান সংস্কার

শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং উচ্চারণ সাধারণত এ দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাংলা বানান গৃহীত হয়েছে। বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে বিশেষভাবে সংস্কৃতানুসারী বানানই প্রচলিত। তদ্ভব এবং দেশজ শব্দে প্রায়োচ্চারণগত বানান দেখা যায়। ধ্বনিভিত্তিক বানান লেখার প্রয়াস বহুকাল আগেই দেখা যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান সংস্কার গৃহীত হওয়ার পরেও উচ্চারণ ও বানানের অসঙ্গতি এখনও কমেনি। তবু সংস্কৃত পণ্ডিতী রীতি কণ্টকিত বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাদি সেকালে বিপ্লবাত্মক ছিল। 'চলন্তিকা' অভিধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক গৃহীত বানানই ব্যবহৃত হয়েছে। এ-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল :—

(১) রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন (২) অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন (৩) ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে

ঙ-র ব্যবহার, যথা ঃ—অহঙ্কার—অহংকার, ভয়ঙ্কর—ভয়ংকর, সঙ্খ্যা—সংখ্যা, সঙ্ঘ—সংঘ, ইত্যাদি। (৪) শব্দের শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন না দেওয়া যথা মত, গভীর, অচল, ওস্তাদ, কাগজ, জজ, চেক ইত্যাদি। হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হলে হ এবং বিদেশী শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে হস্ চিহ্নের ব্যবহার যেমন শাহ্, তখত্, বণ্ড্ ইত্যাদি।

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা এবং বিশেষণ বাচক শব্দের শেষে ঈ-র এবং অন্যত্র প্রধানত ই-র ব্যবহার, যেমন, বাঘিনী, কলুনী, কাবুলী, বাঙালী, পাকিস্তানী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি। ঝি, দিদি, বিধি এ নিয়মের বাইরে।

(৬) কাজ, জাউ, জুত, জাঁতা, জাঁতি জুঁই, জোড়া, জোঁয়াল, প্রভৃতি শব্দে য না লিখে জ এর ব্যবহার।

(৭) সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝানোর জন্যে অতিরিক্ত ও-কার, কমা বা অন্য চিহ্ন যথা সম্ভব বর্জন। অর্থ গ্রহণে বাধা হলে গোটা কতক শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য ও মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা যেমন, কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পণ্ডিত) ইত্যাদি।

(৮) মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তাদের তদ্ভব শব্দে শ, ষ এবং স এর ব্যবহার। যেমন অংশু থেকে আঁশ, আমিষ থেকে আঁষ শস্য থেকে শাঁস, মশক থেকে মশা, পিতৃঃস্বসা থেকে পিসী। ব্যতিক্রম মনুষ্য থেকে মিনসে এবং শ্রদ্ধা থেকে সাধ। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী s স্থানে স, sh স্থানে শ'র ব্যবহার যেমম আসল ক্লাশ, পুলিস, পেনসিল, খুশী, চশমা ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্), ভিস্তি (বিহিশতী) ইত্যাদি। কতকগুলো বিদেশী শব্দে মূলানুসারী বর্ণের প্রচলন যেমন—পুলিস পুলিশ, শহর/সহর, শয়তান/সয়তান, ইত্যাদি। শব্দে যেখানে মূলানুসারী বানানের পরিবর্তে শ/স উভয়েরই ব্যবহার রয়েছে সেখানে সামঞ্জস্যের জন্য যে কোন একটি ব্যবহারের বিধান সুপারিস করা হয়েছে।

(৯) নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দে Cut এর u ধ্বনিকে বিবৃত অ-র মতো ধরে নিয়ে শব্দের আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে

অ-কারের বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন ক্লাব (club), সার (sir), কাট্‌লেট্‌ (Cutlet), সার্কস (Circus), ফোকস (focus), রেডিয়াম (radium), ইত্যাদি।

(১০) cat এর বক্র আ বা বিকৃত এ-র উচ্চারণের জন্য বাংলা আদ্য অক্ষরে অ্যা এবং মধ্য অক্ষরে ্যা-র বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন অ্যাসিড (acid) কিন্তু হ্যাট (hat),

(১১) মূলশব্দের উচ্চারণে ঈ, ঊ থাকলে বাংলা বানানে তার ব্যবহার যেমন ঈষ্ট (east), উষ্টার (worcester)।

(১২) ইংরেজী f ও v স্থানে বাংলায় ফ ও ভ-এর ব্যবহার যেমন ফুট (foot), ভোট (vote)।

(১৩) w স্থানে উ বা ও। যেমন উইলসন (Wilson), উড্‌ (wood), ওয়ে (way) ইত্যাদি।

(১৪) st স্থানে স্ট, যেমন স্টোভ (stove) স্টক (stock) ইত্যাদি

সেকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক গৃহীত বাংলা বানানের জন্য ওপরের নিয়মকানুন যথেষ্ট বৈপ্লবিক ছিল; কিন্তু সর্বত্র যে উচ্চারণ অনুসারী ছিল একথা বলা যায় না। বাংলা বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা উচিত এমন মত রবীন্দ্রনাথও পোষণ করতেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার সব চেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো যে উচ্চারণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় এমনকি একই শব্দের একই ধ্বনির উচ্চারণ একই সময়ে বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্নভাবে শোনা যায়। সে রকম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখলে একদিক দিয়ে যেমন বহু শব্দের চেহারা পাল্টাবে, অন্যদিক দিয়ে হয়তো তেমনি প্রতি শতাব্দী পরে পরেই ধ্বনি অনুযায়ী বানান লেখার প্রয়াস দেখা দেবে। সে রকম হলে বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করা রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। সে জন্যেই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণগতরূপ—এ দুই দিকের প্রতি নজর রেখেই এ যাবৎ বাংলা শব্দের বানান লেখা হয়ে এসেছে।

তবু বর্তমান কালের চলিত বাংলার ধ্বনি ও হরফ এযাবৎ যেভাবে বিশ্লেষণ ক'রে এসেছি সেভাবে বানান সংস্কার করতে চাইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলীর অতিরিক্ত এ নিয়মগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ—

(১) বিদেশী শব্দের ঈ এবং ঊ-র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রতিবর্ণীকরণে ঈ এবং ঊ-র ব্যবহার ছাড়া দেশী বিদেশী, তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই ই-ি'র এবং উ-ু র ব্যবহার; যেমন গান্ধি, বুদ্ধিজিবি, নিড়, অনুসারি, অনুরুপ ইত্যাদি।

(২) 'এ্যা' ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে শব্দের প্রথম অক্ষরে বিকল্পে 'এ্যা'-র সীমিত ব্যবহার। শব্দ মধ্যবর্তী 'এ্যা' ধ্বনির রূপায়ণেও ্যা-র সীমিত ব্যবহার। যেমন একা কিন্তু ন্যাকা, দেখা কিন্তু হ্যাট্ ইত্যাদি।

(৩) 'অ' ধ্বনির প্রতীক 'অ' হরফটির দ্বারা ক্ষেত্র-বিশেষে 'অ', 'ও' এবং ও' এ তিনটি ধ্বনিই চিহ্নিত করা হয়।

অ-কারণ, অ-যাত্রা, অভাব কিংবা করা, ঘর, কলা, জল, গলানো প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে 'অ' ধ্বনিরই প্রতীক কিংবা শব্দের আদ্য অক্ষরে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত স্বর ধ্বনিটি যেখানে অ সেখানকার বর্তমান বানানই থাকবে।

অভিভাবক, অতি, মতি, গরু, সরু, বক্ষ, লক্ষ্য প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে ও ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও বর্তমান বানানই চলতে পারে, কারণ সেখানে ও-ো না লিখলেও, ই, উ এবং ক্ষ কিংবা য-ফলার পূর্বে স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে অ-র উচ্চারণ ও-ই করা হবে। অবশ্য আঞ্চলিক উচ্চারণে এগুলোকে অঅতি, গঅতিও পড়া হয় কিন্তু চলিত বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেকেই এর স্বাভাবিক উচ্চারণই ক'রে থাকেন।

ধন, মন, জন এবং সাগর, মকর, মাকড়সা প্রভৃতি শব্দে শেষ বা মধ্যাক্ষরের ধ, ম, ন এবং গ, ক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত অ-র উচ্চারণ যেখানে 'ও' সেখানেও প্রচলিত বানানই থাকতে পারে। হস্ত, শব্দ, বাল্য, বিল্ব, বিশ্ব, পদ্ম প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে সংযুক্ত হরফ সম্বলিত অ যেখানে ও-র প্রতীক সেখানেও ো- চিহ্ন না দিয়ে বর্তমান বানানই ব্যবহারযোগ্য।

ছিল, গেল, কত, মত, বড়, কর, মার, সারান, ধরান, প্রভৃতি শব্দে শেষাক্ষরের সংশ্লিষ্ট অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে যেখানে অ-র উচ্চারণ 'ও' হয়, শুধু সেখানে ো ব্যবহার বিধেয়। যেমন ছিলো, গেলো, কতো, মতো, বড়ো, মারো, মারানো, ধরানো ইত্যাদি। এরকম হ'লে মত, মার, সারান, ধরান প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে হস্ চিহ্ন ব্যবহার না করলেও পূর্ববর্তী শব্দের তুলনায় তাদের অর্থ-বৈপরীত্য রক্ষা পাবে।

প'ড়ো, ধ'রো, হ'লে, ম'লে, ম'রো প্রভৃতি শব্দের প্রথম অক্ষরের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের অ যেখানে অভিশ্রুত ও'র প্রতীক সেখানে অর্থ-গ্রহণে অসুবিধা হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত সপ্তম বিধান অনুযায়ী ঊর্ধ্ব কমার সীমিত ব্যবহার গ্রহণ যোগ্য।

(৪) ঋ এবং ৃ কার থাকতে হবে। তবে বিদেশী শব্দে ৃ-কার না দিয়ে ্র-ফলা দিয়ে লিখতে হবে, যেমন ব্রিটিশ, খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জন বর্ণে যে-কোনো রকম স্বরধ্বনি যুক্ত হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ কোনো রকমেই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবেনা যেমন শ্‌ু, ত্‌র্‌ু র্‌ু, গ্‌ু, ত্‌র্‌ান, ভ্‌র্‌ুকুটি ইত্যাদি।

(৬) অনুস্বার লুপ্ত হবে, সুতরাং সর্বত্রই ঙ দিয়ে লিখতে হবে, যেমন—রঙ্‌, বাঙ্‌লা, বঙ্কিম, বঙ্গ, বাঙাল, আঙুল ইত্যাদি।

(৭) ঞ লুপ্ত হবে, কিন্তু গ্যা ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফের প্রতীক হিসেবে জ্ঞ রাখা যেতে পারে। যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞ।

(৮) ক্ষমা বক্ষ প্রভৃতি শব্দের জন্যে ক্ষ থাকতে হবে।

(৯) ণ লুপ্ত হবে। সুতরাং কন্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড, গণ্ড প্রভৃতি তৎসম শব্দও কনটক, কন্ঠ, কান্ড, গন্ড রূপে ন দিয়ে লিখতে হবে।

(১০) ষ লুপ্ত হবে। অপ্রচলিত ধর্মীয় এবং বিদেশী শব্দে s ধ্বনির প্রতীক হিসেবে স-র সীমিত ব্যবহার ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার বিধেয়। প্রচলিত বানানের দিক থেকে এ সুপারিসটিই সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক। কারণ এতে সে, আসে, আসা, বসে, শত, আশা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই শ দিয়ে শে, আশে, আশা, (hope এবং come অর্থে) বশে, শত রূপে লিখিত হবে। এবং phoneme তত্ত্বঅনুযায়ী 'শ'ই চলিত বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিসধ্বনি ব'লে ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্ত্য সহধ্বনি 'স'-রও স্বতন্ত্র কোন ধ্বনিচিহ্ন ব্যবহার না করে এমনকি বাশ্‌তব, বশ্‌তু, আশ্‌থা, শ্নান প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ এবং শে্‌টাভ, শ্‌টক, কাশ্‌ঠ ইত্যাদি বিদেশী শব্দও শ দিয়ে লিখিত হবে।* এ

* বিকল্প ব্যবস্থা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

—৪

বিধান গৃহীত হলে আরবী, ফারসী, ص এবং ইংরেজী S এর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আর ছ ব্যবহার করতে হবেনা। তখন ইছলাম, মুছলমান, কেচ্ছা, ছয়লাপ তছনছ, ছহি প্রভৃতি শব্দ ছ দিয়ে না লিখে স দিয়ে ইস্‌লাম, মুসলমান, কেস্‌সা সয়লাপ, তস্‌নস, সহি লেখা যেতে পারে।

(১১) আরবী ফারসীর ذ, ز, এবং ظ ধ্বনি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দের Z ধ্বনির প্রতীক হিসেবে য রেখে তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই জ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে যায়, যে, যাওয়া ইত্যাদি জায়, জে, জাওয়া লিখতে হবে। অবশ্য জাহাজ, হাজার, জোর, জুলুম, জেব্রা, প্রভৃতি যে সব আরবী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং জ দিয়েই দিয়েই লিখিত হয়ে আসছে সেখানে য লেখা অবিধেয় হবে।

(১২) তৎসম শব্দে য ফলা (্য) এবং ব-ফলা যেখানে উচ্চারণে দ্বিত্ব বোধক সেখানে তারা অব্যাহত থাকবে, যেমন সভ্য, বাল্য, বাক্য আশ্বাস, বিদ্বান, সত্বর ইত্যাদি।

(১৩) কিন্তু উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখানে তাদের উচ্চারণ পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদবেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে।

(১৪) শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব ফলার কোন উচ্চারণই বাংলায় নেই, সেখানে ব ফলা ছাড়াই শাপদ, শাশ লেখা, বিধেয়। স্বত্ব, স্বত্বাধিকারী এবং সত্ত্বেও প্রভৃতি শব্দেও পূর্ব নিয়ম ব্যবহার্য কিন্তু সত্ত্বেও শব্দে ত্ত ব্যবহার না করে ত্ব-ফলা ব্যবহার করলেই চলবে। প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী এ শব্দ গুলোর বানান হবে শত্ব, শত্বাধিকারী এবং শত্বেও ইত্যাদি।

(১৫) পুত্র, উজ্জ্বল প্রভৃতি শব্দে ত্র এবং জ্জ্ব না লিখে শুধু ত্‌্র এবং জ্ব লেখাই বিধেয়।

(১৬) ওপরে আলোচিত বিধান গুলো ছাড়া অন্যান্য নিয়মাবলী হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এবং এ যাবৎ প্রচলিত আধুনিক বানানের মতো।

ওপরে উদ্ধৃত বিধান অনুযায়ী বাংলা বানান গৃহীত ও লিখিত হলে তার রূপ কি দাঁড়াবে নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেলো ঃ—

(১) কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। (বিদ্যাসাগর)

এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে ঃ—

কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙ্যোগ হইল। লক্ষন শুমন্ত্রকে শেই শথানে রথ রাখিতে বলিয়া শিতাকে তরনিতে আরোহন করাইলেন এবঙ্ কিয়তক্ষন মধ্যেই তাঁহারে ভাগিরথির অপর পারে উতিতর্ণ করিলেন। শিতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উতশুক হইয়া তদভিমুখে প্রশথান করিবার উপক্রম করিলেন।
(বিদ্যাশাগর)

(২) তথাচ সাধুর সংবিৎ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার উপমা ভালেরির স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ, যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞাণতরুর মূলে পাহারা জাগে, এবং তৎসত্ত্বেও সত্য আর সৌন্দর্যের সন্ধানে বেরিয়ে, আমরা যখন সেই শেষ নাগকে পেরিয়েই বাস্তবিক অবগতির সামনে আসি, তখন সদাচারের মতো লৌকিক ব্যাপারে আমরা তার বিষদংশন সইব কোন্ লোভে? বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া না গেলে বার্কলির প্রজ্ঞাবাদকে আর দোষ দেওয়া চলে না; এবং তার পরে আমাদের মানতেই হয় যে সত্য কেন, যে-বস্তু সত্যের আধার, তার অস্তিত্ব সুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞানসাপেক্ষ। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে ঃ—

তথাচ শাধুর শঙবিত ব্রমেহর শঙ্গে তুলনিয় নয়, তার উপমা ভালেরির শাবলম্বী ভুজঙ্গ। জে নিজের পুচ্ছকে উপজিবা ক'রে অনাদন্ত কাল জ্ঞান তরুর মূলে পাহারা জাগে; এবঙ্ ততশত্বেও শত্য আর শোন্দর্জের শন্ধানে বেরিয়ে, আমরা জখন "শেই শেশনাগকে পেরিয়ে বাশতবিক অবগতির শামনে আশি, তখন শদাচারের মতো লউকিক ব্যাপারে আমরা তার বিশদঙশন শইব কোন্ লোভে? বশতু শাতন্ত্রবাদে এ প্রশ্নের শদুতত্তর পাওয়া না গেলে বাক্লির

প্রজ্ঞাবাদকে আর দোশ দেওয়া চলেনা; এবঙ তার পরে আমাদের মানতেই হয় জে শত্য কেনো, জ্ঞে বশ্তু শত্যের আধার তার অশিত্তত্ব শুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞান শাপেক্ষ। (শুধিন্দ্রনাথ দত্ত)

(৩)

কৌতুহল অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল, শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কন কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর.
লোলুপ লেলিহজিহব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফনা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

(রবীন্দ্রনাথ)

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে লিখিত হলে এ অংশটুকুর রূপ দাঁড়াবে ঃ

কউতুহল অবশান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রান
মাশির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মশৃন চিক্কন কৃশ্ন কুটিল নিশ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহব শর্পশম ক্রুর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফনা
ফুঁশিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

(রবিন্দ্রনাথ)

আমার ব্যাখ্যাত Phoneme তত্ত্বানুযায়ী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শিসধ্বনি ‘শ’-ই মূলধ্বনি এবং ‘ষ’ ও ‘স’ তার allophone বা সহধ্বনি। বাংলা লিপি ও বানান মূলধ্বনি ধর্মানুসারী করার জন্যেই ‘শ’ এর সহধ্বনি ‘ষ’ ও ‘স’-এর কোনো প্রতিলিপি না রেখে সর্বত্রই মূলধ্বনি ‘শ’ এর প্রতিলিপি

শ-হরফটি রাখার আমি সুপারিশ করেছি। এ সুপারিশ মতে স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্ন, স্প. স্পৃ, স্প্র, স্ফ. স্র, স্ব, স্ত্র-ধ্বনি সমন্বিত সংযুক্ত হরফ গুলোও শ্‌ক শ্‌খ, শ্‌ত, শ্‌থ, শ্ন, শ্‌প শ্‌পৃ. শ্‌প্র, শ্‌ফ, শ্র. শ্‌ত্র ভাবে লিখিত হবার কথা বলেছি! এ ভাবে লিখলে ধ্বনি প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হবেনা কারণ এ-সব পরি পরিবেশে বানান যা-ই লিখিনা কেন বাঙালী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিসধ্বনির পরিবেশ ভিত্তিক অগ্রদন্তমূলীয় 'স' উচ্চারণই করবে। কিন্তু এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রথমদিকে আমাদের চক্ষুসহ হবে না বলে অনেকে আপত্তি করতে পারেন। তাঁদের মতকে গুরুত্ব দিতে হলে এরও এ ভাবে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়ঃ—

আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী s ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে স রাখার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হলে বাংলা বর্ণমালায় শ ও স দুটো হরফই থাকে। স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে না হলেও বাঙালীর চোখ শ ও স-র হরফগ্রাহ্য রূপের সঙ্গে পরিচিত বলেই স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্ব, স্পৃ, স্প্র, স্ফ, স্র প্রভৃতি বাংলা লিপি ও বানানে প্রচলিত এ হরফ গুলোতে স ধ্বনিটিকে মূলধ্বনি 'শ'র অগ্রদন্ত মূলীয় রূপ না বলে অগ্রদন্তমূলীয় 'স'কেই মূল ধ্বনি হিসেবে ধরে এ পরিবেশ গুলোতে তার অপরিবর্তিত ধ্বনি রূপের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বলা যেতে পারে। আবার 'আস্তে' এবং 'আসতে' (to come) কিংবা 'কাস্তে' ও 'কাশতে' (to cough) শব্দে কেউ কেউ 'স' ও 'শ' কে স্বতন্ত্র অর্থসৃষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে চান। এ রকম হলে এ কয়টি সংযুক্ত বর্ণের ব্যাপারে বাঙালীর এতকালের অভ্যস্ত চোখ ও কান কিছুটা রেহায় পায়। তাতে প্রচলিত বানানে শ্রাবণ, বিশ্রী, শ্রী, শ্লীল, শ্লেষ, প্রশ্ন প্রভৃতি শব্দে 'শ' এর সহধ্বনি হিসেবে স'কে শ দিয়েই রূপায়িত করতে হবে। অন্য কথায় এ-সব ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই রক্ষিত হবে কিন্তু অন্যান্য সংযুক্তাক্ষরগুলোতে স যেখানে দন্ত্য কিংবা অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনির প্রতিরূপ কিংবা ষ্টেশান, ষ্টোভ, ষ্টক্ প্রভৃতি শব্দে ট-এর সঙ্গে যেখানে বানানে ষ থাকলেও অগ্রদন্তমূলীয় 'স' ধ্বনি শোনা যায় সেখানেও স-ই ব্যবহৃত হবে। এ সংযুক্ত বর্ণগুলো এবং বিদেশীধ্বনির অনুলিপি সংক্রান্ত পরিবেশ ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার্য। তেমন হলে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন হবে না এবং অন্যান্য সুপারিশও সাধারণ্যে সহজে গৃহীত হবে।

এ বিকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলো যেভাবে লিখিত হতে পারে তার একটির অনুলিপি দেওয়া গেলো ঃ—

(১) কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙ্‌যোগ হইল। লক্ষন শুমন্তকে শেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া শিতাকে তরনিতে আরোহন করাইলেন এবং কিয়তক্ষন মধ্যেই তাঁহারে ভাগিরথির অপর পারে উত্তির্ণ করিলেন। শিতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্‌তে নিতান্ত উতশুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

(বিদ্যাশাগর)